ইউনিট ৫

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্র-কৃতিত্ব ও সংস্কারসমূহ

ভূমিকা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা) ছিলেন আদর্শের মূর্ত প্রতীক। তাঁর জীবনে রয়েছে বিশ্ব মানবতার জন্য সর্বোত্তম জীবনাদর্শ। তাঁর গোটা জীবনই ছিল অনুরূপ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। দুনিয়ার বুকে আল্লাহর প্রেরিত সকল নবীর ও মহামানবদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা) একমাত্র ব্যক্তি যাঁর জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ঘটনা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন বিশ্বনবী হিসেবে সকলের স্নেহের পাত্র, স্বামী হিসেবে প্রেমময়, পিতা হিসেবে স্নেহের আধার ও বন্ধু হিসেবে বিশ্বস্ত। উপরন্তু তিনি ছিলেন সফল আদর্শ ব্যবসায়ী, দূরদর্শী- সংস্কারক, বীর যোদ্ধা, নিপুন সেনা-নায়ক, নিরপেক্ষ বিচারক, মহান রাজনীতিক এবং অপরাপর মহৎ গুণের অধিকারী। সর্বক্ষেত্রে তিনি সততা, ব্যক্তিত্ব ও অপূর্ব সাফল্য সহকারে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। সর্বক্ষেত্রেই তিনি যথোপযুক্ত সংস্কার সাধন করে গিয়েছেন। মানব চরিত্রের সকল প্রকার মহৎগুণের অনন্য সমন্বয় সাধন করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। পৃথিবীতে যত নবী-রাসুল ও মহামানব এসেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই কোন এক বিশেষ ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করেছিলেন। মহানবী (স) ছিলেন বিশ্ব ইতিহাসের এক অনন্যাধারণ কীর্তিমান মহা মানব।

এই ইউনিটে হযরত মুহাম্মদ (স) এর চরিত্র কৃতিত্ব ও সংস্কারসমূহ জানতে পারবেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্র ও জীবনাদর্শ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

চরিত্র

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মহামানব। মহান প্রভু তাঁর অপার করুণায় বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ (স)-কে এ পৃথিবীতে 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' তথা নিখিল বিশ্বের করুণার ছবি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মানবীয় চরিত্রে যত মহৎ গুণ-বৈশিষ্ট্য হতে পারে, অনিন্দ্য সুন্দর যা কিছু মহৎ গুণের কথা মানুষ কল্পনা করতে পারে, বিশ্বনবীর (স) পূত-জীবন চরিত্রে তার পূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল। মহান আল্লাহ তাই তাঁর প্রশংসায় ঘোষণা করেন-

"নিশ্চয়ই আপনি মহান উন্নততম চরিত্রের ধারক।" আসলে তাঁর পূত-জীবন চরিত্র হচ্ছে বিশ্ব মানবতার জন্য উৎকৃষ্টতম আদর্শ। এ মর্মে আল-কুরআনের ঘোষণা: "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবন চরিত্রে রয়েছে মহান আদর্শ।' এখানে মহানবীর (স) জীবনাদর্শের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলঃ

আল্লাহতে বিশ্বাস ও ভরসা

বিশ্বনবীর (স) চরিত্রের সর্বোৎকৃষ্ট ভিত্তি ছিল আল্লাহতে প্রগাঢ় বিশ্বাস এবং যাবতীয় বিপদে-আপদে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর উপর নির্ভরতা ও ভরসা।

মহানবী ছিলেন আল-কুরআনের মূর্ত প্রতীক

মহানবীর (স) জীবনাদর্শই ছিল আল-কুরআন। হযরত আয়েশা (রা) ভাষায় ঃ "তিনি ছিলেন আল-কুরআনের মূর্ত প্রতীক।" তিনি তাঁর জীবনে আল-কুরআনের প্রতিটি অনুশাসনের রূপায়ণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন। এজন্য তাঁকে 'জীবন্ত কুরআন'ও বলা হয়।

ন্যায়পরায়ণতা

ন্যায়পরায়ণতা মহানবীর (স) জীবনের এক উজ্জ্বলতম আদর্শ। ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে তিনি যে অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। বিচারে তিনি ধনী-নির্ধন, আত্মীয়-অনাত্মীয়, শত্রু-মিত্র, স্বজাতি-বিজাতি, অভিজাত-ইতর, নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রমুখের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করেননি। চুরির অপরাধে অভিজাত কুরাইশ বংশীয় এক রমণীর হাত কাঁটা নিয়ে কথা উঠলে তিনি জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন ঃ "যদি আমার মেয়ে ফাতিমাও (রা) চুরি করতো, আল্লাহর শপথ! আমি তাঁর হাতও কেটে দিতাম।"

আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা

হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন মহান আমানতদার, বিশ্বস্ততার মূর্ত প্রতীক। তাঁর অকৃত্রিম বিশ্বস্ততার গুণে মুগ্ধ শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলে তাঁর নিকট তাদের ধন-সম্পদ, সোনা-দানা গচ্ছিত রাখতো। তিনি গচ্ছিত সম্পদ অতি যত্নের সাথে হিফাজত করতেন এবং চাহিবামাত্র তার মালিককে যথার্থভাবে প্রত্যার্পণ করতেন। এ মহতী গুণের কারণেই মানবতার চরম দুর্দিনেও তিনি শত্রু-মিত্র সকলের নিকট 'আল-আমিন' ও 'আস সাদিক' সত্যবাদীতার দুর্লভ উপাধিতে বিভূষিত হন।

ওয়াদা বা অঙ্গীকার পালন

ওয়াদা পূরণ বা অঙ্গীকার পালন করা নবী (স) চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার পালন না করা তিনি জঘন্যতম পাপ বলে অভিহিত করেন। তিনি ঘোষণা করেন "যে অঙ্গীকার পালন করে না তার ধর্ম নেই।" তাই তিনি নির্দেশ দেন ঃ "তোমরা যখন অঙ্গীকার করবে, তখন তা পালন করবে।"

সত্যবাদিতা

বিশ্বনবীর (স) জীবনাদর্শ ছিলো সততা ও সত্যবাদিতায় পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন সত্যবাদিতার জীবন্ত প্রতীক। তিনি সর্বদা সত্য বলতেন, সত্যের অনুসরণ করতেন। জীবনের কোন কঠিন অবস্থায়ও তাঁকে মিথ্যার ছোঁয়া স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি সত্যবাদিতা সম্পর্কে বলেন ঃ "সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়, মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।"

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা ছিল মহানবীর (স) চরিত্রের অলংকার। ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি বহু বাধা-বিঘ্ন, অত্যাচার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও অবর্ণনীয় নির্যাতন আম্লান বদনে সহ্য করেছেন। কিন্তু অভিষ্ট লক্ষ্য হতে তিনি কখনো বিচ্যুত হননি। চরম বিপদের মুহূর্তেও তিনি এতটুকু ধৈর্য হারা হননি। তিনি বলেন, ধৈর্যের চেয়ে অধিকতর কল্যাণকর জিনিস আর কিছুই কাউকে দান করা হয়নি।"

বিনয় ও নম্রতা

বিনয়, নম্রতা ও কোমলতা ছিল মহানবীর (স) চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তিনি সকলের সাথে খুবই কোমল ব্যবহার করতেন। জীবনে কোনদিন তিনি কারো সঙ্গে রূঢ়-আচরণ কিংবা কটু বা শক্ত কথা বলে এতটুকু কষ্টও দেননি। দাস-দাসী, এমনকি চরম শত্রুরাও তাঁর বিনম্র ব্যবহারে বিমুগ্ধ ছিলো।

ক্ষমা ও ঔদার্য

'ক্ষমা যে মহত্ত্বের লক্ষণ' এ গুণটি মহাবনীর (স) জীবন চরিত্রের সর্বক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন ক্ষমা ও ঔদার্যের মূর্ত প্রতীক। প্রাণঘাতী শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন সহাস্য বদনে। মক্কা ও তায়িফ বিজয়ের সময় তিনি ক্ষমার যে আদর্শ স্থাপন করেন, বিশ্ব ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। তিনি বিশ্বের বুকে ক্ষমার যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

আর্ত মানবতার সেবা

আর্ত মানবতার দরদী বন্ধু মহানবীর (স) জীবনটাই ছিল দীন-দুঃখী, ইয়াতীম, অসহায়, দুঃস্থ ও বিপন্ন মানুষের সেবায় নিবেদিত। তিনি ছিলেন গরীব-দুঃখীদের অকৃত্রিম আপনজন। মানবেতিহাসে তাঁর মতো মাবনতার কল্যাণকামী ও দীন-দরদী বন্ধু খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আড়ম্বরহীন জীবন

মহানবী (স) নিতান্ত সহজ-সরল সাধারণ ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। বিলাসিতা, জাঁকজমকপূর্ণ ও চমকপ্রদ জীবনাচার তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না। দরিদ্রতা আর প্রাচুর্য উভয় অবস্থাতেই তিনি ছিলেন সহজ-সরল ও নিরহংকার।

উদারতা

উদারতা ছিল নবী চরিত্রের ভূষণ। সংকীর্ণতা তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। শত্রু-মিত্র, আপন-পর সকলের প্রতিই তিনি ছিলেন উদার।

শ্রমের মর্যাদা

শ্রমের প্রতি উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এবং শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজ হাতে কাজ করে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তিনি শিখিয়েছেন- কাজ তা যতই ছোট হোক না কেন, সেটা আমানত স্বরূপ। নিজ হাতে জীবিকার্জনকে পুণ্যের কাজ বলে তিনি আখ্যায়িত করেছেন।

বদান্যতা

মহানবীর (স)-এর বদান্যতা ছিল তাঁর অন্যতম জীবনাদর্শ। দয়া ও দানশীলতা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ।

দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনাদর্শ

মহানবীর (স) দৈনন্দিন ও ব্যবহারিক জীবনের সকল কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, চাল-চলন, উঠা-বসা, মেলা-মেশা, পোশাক-পরিচ্ছদ, পানাহার প্রভৃতি সবকিছুতেই অনুপম আদর্শের নিদর্শন পরিলক্ষিত হতো। যেমনঃ

কথা-বার্তা ঃ হযরত নবী করীম (স) অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট ভাষায় ধীর স্থিরভাবে কথা-বার্তা বলতেন। বিনা প্রয়োজনে এবং অতিরিক্ত ও অযথা কোন কথা বলতেন না। গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো শ্রোতাদের হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রায়ই তিনবার করে বলতেন।

পানাহার ঃ মহানবীর (স) পানাহার ছিল তার আদর্শের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি খাদ্য গ্রহণের সময়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাতে সম্মুখ ভাগ থেকে অত্যন্ত আদবের সাথে বসে খেতেন। তিনি কোন খানা উচ্ছিষ্ট ও অপচয় করতেন না। পেটের কিছু ক্ষুধা রেখেই খাওয়া শেষ করতেন। পানি গ্রহণের সময় এক নিঃশ্বাসে সবটুকু পানি পান না করে ধীরে ধীরে পান করতেন। যমযম ও ওযুর পানি ছাড়া সকল ক্ষেত্রে তিনি বসে পানি পান করতেন।

চলাফেরা ঃ হযরত মুহাম্মদ (স) অতিশয় শান্ত-শিষ্ট ও ভদ্রভাবে আনত নয়নে চলাফেরা করতেন। তাঁর চলাফেরায় কোনরূপ চঞ্চলতা কিংবা অলসতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি।

উঠা-বসা ঃ হযরত নবী করীম (স) নতজানু হয়ে অতীব বিনম্রভাবে বসতেন। বসা অবস্থা থেকে কাউকে উঠিয়ে দিয়ে সে স্থানে নিজে বসতেন না। উঠা-বসায় আল্লাহর যিকির করতেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে মহানবী (স) অত্যুজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল খুবই মার্জিত, রুচিশীল, শালীন ও স্বাভাবিক। সাধারণ তহবন্দ, জামা ও চাদর পরিধান করতেন। মাথায় টুপি ও পাগড়ি ব্যবহার করতেন। আল্লাহ ও রাসূলের নামাঙ্কিত রৌপ্য নির্মিত আংটি পড়তেন। একে তিনি সীলমোহর হিসেবে ব্যবহার করতেন। জাঁকজমকপূর্ণ ও চাকচিক্যময় এবং অহংকার প্রকাশ পায় এমন পোশাক পছন্দ করতেন না।

সালাম-সম্ভাষণ ঃ মহানবী (স) চলতে-ফিরতে, রাস্তা-ঘাটে, বাড়িতে, মজলিসে সবখানেই কারো সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হলে হাসিমুখে সালাম জানাতেন, কুশলাদি বিনিময় ও সম্ভাষণ করতেন। সালামের ব্যাপারে তিনি ছিলেন সর্বদাই অগ্রণী। তিনি বলেছেন ঃ "পরিচিত হোক অপরিচিত হোক সকলকে সালাম দেবে।"

হাসি ঃ মহানবী (স) আনন্দ সুন্দর ও পরিমিতভাবে হাসতেন- যাতে ভদ্রতা, সৌজন্য, আদব ও গম্ভীর্য এবং আভিজাত্যের ছাপ ফুটে উঠতো। কখনো উচ্চস্বরে বা অট্টহাসি দিতেন না।

শয়ন ও নিদ্রা ঃ নবী করীম (স) শয়ন ও নিদ্রার ক্ষেত্রেও এক উজ্জ্বল আদর্শ রেখে গেছেন। তাঁর শয়ন গৃহ ও বিছানা খুবই সাদাসিধে ধরনের ছিল। তিনি ডান কাতে হাত গালের নিচে রেখে শুতেন। শোবার আগে ওযু করে এবং কুরআনের আয়াত ও দু'আ পাঠ করে শুতেন।

বাহ্য-প্রস্রাব ঃ মহানবী (স) বাহ্য-প্রস্রাব করার ব্যাপারেও আদর্শ রেখে গেছেন। কা'বা শরীফকে সম্মুখ বা পেছনে ফেলে, রাস্তার ধারে, গাছের নীচে, পানির ঘাটে বাহ্য-প্রস্রাব করতেন না। বাহ্য-প্রস্রাবের পর বেজোড় সংখ্যক ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করে পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করে উত্তমরূপে পাক-পবিত্র হতেন।

পাক-পবিত্রতা ঃ মহানবী (স) সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পূত-পবিত্র এবং পাক-সাফ থাকতেন। তিনি বলেছেন ঃ 'পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ'। তিনি সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। মেসওয়াক করতেন দৈনিক অন্তত পাঁচ বার।

লজ্জাশীলতা ঃ প্রিয় নবীর (স) সর্বোত্তম আদর্শ ছিল তাঁর লজ্জাশীলতা। লজ্জাশীলতা ছিল তাঁর চরিত্রের মহান ভূষণ। লজ্জাশীলতা সম্পর্কে তিনি বলেন-"লজ্জা হলো ঈমানের অঙ্গ।"

বস্তুত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতিটি বাণী, কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, আচরণ এবং তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও তৎপরবর্তী বিশ্ববাসীর জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্টতম, অনুসরণীয়, অনুকরণীয় আদর্শ। একটি অনুপম আদর্শ ও চরিত্রে যতগুলো মহৎগুণ প্রয়োজন, মানব হিতৈষী বিশ্বনেতা মহানবীর (স) চরিত্রে তার সবগুলোরই অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি তাঁর উৎকৃষ্টতম আদর্শের মাধ্যমে বিশ্ব মানবতাকে সত্যের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। তাঁর অনুপম আদর্শে মুগ্ধ মানুষ দলে দলে ইসলামের শান্তির পতাকাতলে সমবেত হয়ে তাঁর আদর্শে নিজেদের জীবনকে উজ্জ্বল করে গড়ে তুলেছিল। মানব জীবনের প্রতিটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি বিশ্ব মানবতার জন্য শ্রেষ্ঠতম ও অনিন্দ্য সুন্দর অনুসরণীয় আদর্শ উপহার দিয়ে গেছেন- যা প্রতিটি যুগ ও শতাব্দীর মানুষের জন্য মুক্তির দিশারী হিসেবে চির-ভাস্বর হয়ে থাকবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. নিখিল বিশ্বের করুণার ছবি হিসেবে পৃথিবীতে এসেছিলেন-
   ক. যিশু খ্রিস্ট খ. সক্রেটিস
   খ. আদম (আ) ঘ. হযরত মুহাম্মদ (স)

২. বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে শত্রু-মিত্র সকলেই ধন-সম্পদ, সোনা-দানা গচ্ছিত রাখতো-
   ক. হযরত আবু বকর (রা) এর কাছে খ. হযরত উমরের (রা) কাছে
   গ. হযরত মুহাম্মদের (সা) কাছে ঘ. হযরত আলীর (রা) কাছে

৩. লজ্জা ঈমানের অঙ্গ'- কথাটি বলেছেন-
   ক. আল্লাহ তাআলায় খ. কুরআন
   গ. হযরত আলীর (রা) ঘ. হযরত মুহাম্মদ (স)

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) এর অনুপম চরিত্রের কতিপয় দিক বর্ণনা করুন।
২. আর্তমানবতার সেবা ও শ্রমের মর্যাদার ক্ষেত্রে মহানবীর ভূমিকা কেমন ছিল?
৩. আমানতদারি ও সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (স) এর চরিত্র কেমন ছিল মূল্যায়ন করুন।
৪. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর দৈনন্দিন জীবনাদর্শ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ধর্মীয় সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স) ধর্মীয় ক্ষেত্রে কি কি সংস্কার করেছেন, তার বিবরণ দিতে পারবেন
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ধর্মীয় সংস্কার ও শিক্ষা মূল্যায়ন করতে পারবেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু এবং শ্রেষ্ঠতম সংস্কারক। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- বিশ্বনবীর (স) আবির্ভাবকালীন সময় এবং তাঁর পূর্বে বিশ্বের সর্বত্র চলছিল ধর্মীয় অবস্থার দুর্দিন। কোথাও তাওহীদের শিক্ষা ছিল না। ব্যক্তি পূজা, প্রকৃতি পূজা, জড় পূজা এবং কল্পিত দেব-দেবীর পূজার তাণ্ডবলীলায় সর্বত্র মানবতার চির উন্নত শির নত হচ্ছিল তুচ্ছ জিনিসের পদমূলে। মানবতা ও ধর্মের এহেন শোচনীয় দুরবস্থার সন্ধিক্ষণে পরম করুণাময় আল্লাহতাআলা সংস্কারক হিসেবে মহানবী মুহাম্মদ (স)কে পাঠিয়ে ছিলেন। ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কারে মহানবীর (স) অবদানের কিছু দিক তুলে ধরা হল-

একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা

সুদীর্ঘ কয়েক শতাব্দী বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলার তাওহীদ বা একত্ববাদের শিক্ষা পৃথিবীর কোথাও ছিল না। মহানবী (স) এ সময় বিশ্ববাসীকে আহ্বান করলেন মহান স্রষ্টার একত্ববাদের দিকে। ঘোষণা করলেন 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল।'

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, পালনকারী, রক্ষাকর্তা, আইনদাতা ও নিয়ন্ত্রক একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তিনিই সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির নিরঙ্কুশ অধিকারী। মহানবী (স)-কে আল্লাহ তাঁর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেনঃ 'সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নেই।' তিনি মহানবী (স)-কে আরও ঘোষণা করতে বলেন- 'আপনি বলুন, আল্লাহ একক সত্তা। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।'

পৌত্তলিকতার অবসান

মহানবী (স) যুগ যুগ ধরে লালিত পৌত্তলিকতা ও শিরকতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত হানেন। অসংখ্য দেব-দেবী ও মূর্তি রক্ষিত পবিত্র কা'বা গৃহ আবার পূত পবিত্র করে মহান আল্লাহর একত্ববাদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করলেন। বহুকালের ওহীজ্ঞান বর্জিত নিরক্ষর বর্বর আরব জাতি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই একত্ববাদের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাদের শিক্ষাগুরু মানবতার মূর্ত প্রতীক মহানবীর (স) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাওহীদে উজ্জীবিত একটি জাতিতে পরিণত হলো।

ভ্রান্ত বিশ্বাসের পরিবর্তন

জাহিলী যুগে লোকদের বিশ্বাস ছিল সমাজে যারাই প্রভাবশালী, ক্ষমতাবান বিত্তশালী তারাই শ্রেষ্ঠ, তারাই সম্মানিত। তারা যা খুশি করতে পারে, তাদের অন্যায় ও পাপের জন্য জবাবদিহি করতে হবে না। মানবতার মূর্ত প্রতীক বিশ্বনেতা মহানবী (স) তাদের এহেন ভ্রান্ত ধারণার চির অবসান ঘটিয়ে আল-কুরআনের ঘোষণা শোনালেন- 'তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু।'

যাজকতন্ত্রের অবসান

অন্ধকার যুগে এক শ্রেণীর লোকদের ধারণা ছিল, ভাল কাজ করলেই স্বর্গে যাওয়া যাবে না; বরং স্বর্গের চাবিকাঠি একমাত্র ধর্মযাজকদের হাতে। তাদের খুশি করতে পারলে স্বর্গে যেতে কোন অসুবিধা হবে না-যত পাপই করা হোক না কেন। এহেন অলীক ধারণার অবসান ঘটিয়ে নবী করীম (স) কুরআনের বাণী শোনালেন-

সেদিন কেউ কার কোন উপকারে আসবে না, একে অন্যের কোন বোঝাও গ্রহণ করবে না; এমনকি কেউ কার জন্য কোনরূপ সুপারিশ করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।"

জন্মান্তরবাদ-এর পরিবর্তন

মুক্তির দিশারী নবী মুহাম্মদ (স) অজ্ঞযুগের আরেকটি অন্ধ বিশ্বাস 'জন্মান্তরবাদ' তথা 'মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হয়ে পৃথিবীতে পূর্ব কৃত কর্মফল ভোগ করার জন্য আবার আগমন করবে'। এই ধারণা বিদূরিত করে ঘোষণা করলেন-

"কোন মানুষই মৃত্যুবরণের পর পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবে না; বরং শেষ বিচার দিবসে হিসেব-নিকেশ দিতে পুনরুত্থিত হবে এবং স্বীয় কর্মফল অনুসারে জান্নাত বা জাহান্নামে অনন্তকাল অবস্থান করবে।"

পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস

প্রাক-ইসলামী যুগে মানুষেরা মৃত্যুর পর হাশর, পুনরুত্থান, কিয়ামত, বেহেশ্‌ত-দোযখ তথা পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস করত না। মহানবী (স) শিক্ষা দিলেন, এ দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর সবাই পুনরুত্থিত হবে এবং কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ করতে হবে।

ইহুদি-খ্রিস্টানদের ধারণার অপনোদন

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধারণা ছিল, "তারা যতই পাপকর্ম করুক না কেন, তাদের শাস্তি পেতে হবে না; পেলেও মাত্র চল্লিশ দিন কিংবা অল্প ক'দিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেছেন যীশু।" মহানবী (স) তাদের এ অলীক ও মিথ্যা ধারণার অপনোদন করে ঘোষণা দিলেন কুর'আনের বাণী- 'একের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না।'

সকল নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস

মহানবী (স) শিক্ষা দিলেন - মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ও সৎপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ পাক যুগে যুগে অগণিত নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। সকল নবী-রাসূলের প্রতি সমানভাবে ঈমান আনতে হবে। কার ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা চলবে না। তিনি কুরআনের ঘোষণা বাণী শোনালেন 'আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না।' (সূরা বাকারা ঃ ২৮৫)

আল্লাহর ইবাদত

মহানবী (স) মানবজাতিকে শিক্ষা দিলেন, আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকারের সাথে সাথে আল্লাহর ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। যাবতীয় গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদত থেকে মানবজাতিকে তিনি একক আল্লাহর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসলেন।

ইসলামী শরী'আতের শিক্ষা

মহানবী (স) মহান স্রষ্টার ইবাদত-বন্দেগীতে যেন জীবনব্যাপী ব্যাপৃত থাকতে পারে, সে ব্যাপারে মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। ইসলামী শরী'আতের মূল শিক্ষা কালিমা, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত সম্পর্কে তাদের এমনিভাবে শিক্ষা দিলেন, যা প্রতিটি বিশ্বাসীর জীবনকে এক নতুন আলোর পথের সন্ধান দিল।

নামাযের শিক্ষা

মহানবী (স) নামাযের মাধ্যমে বিনয়াবনতভাবে মহান স্রষ্টার নিকট তারই সৃষ্টজীব হিসেবে আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করার শিক্ষা দিয়েছেন। নামায মানুষকে যাবতীয় অন্যায়, অনাচার ও পাপাচার থেকে রক্ষা করে সত্যের পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে।

রোযার শিক্ষা

মহানবী (স) মানবীয় কু-প্রবৃত্তিগুলো দমন করার জন্য এবং মহান আল্লাহর প্রতি ভালবাসা জাগ্রত করার লক্ষ্যে রমযান মাসের দীর্ঘ সিয়াম-সাধনার শিক্ষা দান করেন। এ সিয়াম-সাধনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে খোদাভীতি ও দায়িত্বানুভূতি সৃষ্টি হয়।

হজ্জের শিক্ষা

একজন ভক্তপ্রাণ বান্দা মহান আল্লাহর প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে তাঁরই দরবারে হাযির হওয়ার মানসে পবিত্র কা'বা গৃহের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করার মহড়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ ও বান্দার সাথে সুনিবিড় সম্পর্কের প্রমাণ দেয়। তাছাড়া এ মহাসম্মিলনের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্বের অনুপম বন্ধন সৃষ্টি হয়। আর সকলকে শিক্ষা দেয় একতা ঐক্য সাম্যের মূলমন্ত্র - যা চির অক্ষয়-চির অবিনশ্বর।

যাকাতের শিক্ষা

মহানবী (স) যাকাতের শিক্ষা দিয়ে একদিকে যেমন ধন-সম্পদকে পূত-পবিত্র ও প্রবৃদ্ধি সাধনের ব্যবস্থা করেছেন, তেমনি অভাবী ও নিঃস্ব মানুষের অভাব মোচনের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে সম্পর্কের 'সেতু বন্ধন' সৃষ্টি করে অভাবনীয় শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতিতে ভরা সমাজ গড়ার ব্যবস্থা করেছেন।

ইসলামই মানবতার মুক্তি সনদ

মানবতার নবী মুহাম্মদ (স) মানবজাতিকে শিক্ষা দিলেন, ইসলামই বিশ্ব মানবতার একমাত্র মুক্তি সনদ। মানুষের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত সকল দিক ও বিভাগে ইসলামী দিকনির্দেশনা রয়েছে। যার অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ পেতে পারে স্বর্গীয় সুখ-শান্তির ফলগুধারা এ ধূলীর ধরণীতে থেকেই।

সার-সংক্ষেপ

মহানবী (স) ধর্মীয় শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে যে অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন, তার নজীর বিশ্ব ইতিহাসে আর কারো জীবনে মেলে না। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর ধর্মীয় শিক্ষা চির সুন্দর, নিত্য-সত্য নির্ভেজাল ও অম্লান দীপ্তিতে সদা দেদীপ্যমান যা সর্বকালের সর্বদেশের বিশ্বমানবতার মুক্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৪.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. বিশ্ব নবীর (স) আবির্ভাবকালীন সময় মানুষের মাথানত হতো-
   ক. তুচ্ছ জিনিসের পদমূলে খ. মূর্তির সামনে
   গ. রাজা-বাদশাহদের সামনে ঘ. সমাজপতিদের সামনে।

২. মহানবী (স) বিশ্ববাসীকে আহ্বান করলেন-
   ক. গণতন্ত্রের দিকে খ. সামাজিক সাম্যের দিকে
   গ. মহান স্রস্টার একত্ববাদের দিকে ঘ. অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে

৩. ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হচ্ছে-
   ক. জনগণ খ. রাষ্ট্র
   গ. সমাজ ঘ. একমাত্র আল্লাহর

৪. মৃত্যুর পর পুণরায় পৃথিবীতে ফিরে আসার মত বাদকে বলে-
   ক. জন্মান্তরবাদ খ. পুনরুত্থানবাদ
   গ. হাশর ঘ. আখিরাত

৫. যাবতীয় 'গাইরুল্লাহ'র ইবাদত থেকে মানবজাতিকে মহানবী (স) যাঁর ইবাদতের দিকে নিয়ে আসেন তিনি হলেন-
   ক. এক আল্লাহর খ. বিশ্ব নবীর
   গ. পীর-মুর্শিদের ঘ. অদৃশ্য জগতের

৬. বিশ্বনবী (স) মানবজাতিকে শিক্ষা দিলেন-
   ক. মিলাদ শরীফ পড়ার খ. নামায-রোযা করার
   গ. পরোপকার করার ঘ. ইসলামই বিশ্বমানবতার একমাত্র মুক্তি-সনদ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) এর আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মীয় অবস্থা কেমন ছিল?
২. হযরত মুহাম্মদ (স) ধর্মীয় ক্ষেত্রে কি কি সংস্কার করেছিলেন- তার পাঁচটি উদাহরণ দিন।
৩. সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে মহানবী (স) শিক্ষা কি?
৪. পৌত্তলিকতার ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা কি?
৫. ইসলামই মানবতার মুক্তির সনদ বিশ্লেষণ করুন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সামাজিক সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সামাজিক সংস্কারসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন
- সমাজ সংস্কারক হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

প্রাক ইসলামী যুগে গোটা বিশ্বসহ আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। গোত্র-কলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, হানাহানি, প্রভৃতি নৈরাজ্যপূর্ণ অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল গোটা সমাজ। সামাজিক সাম্য, শৃঙ্খলা, ভদ্রতা, সৌজন্যবোধ, নারীর মর্যাদা বা মানব মর্যাদার কোন বালাই ছিল না। দাসত্ব প্রথা, সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, অন্যায়-অনাচারে সমাজ কাঠামো ধ্বংস হয়ে পড়েছিল। এমনি এক দুর্যোগপূর্ণ যুগ সন্ধিক্ষণে মহানবী (স)-এর আবির্ভাব। মহানবী (স) ঐ সকল যাবতীয় অরাজকতার মূলোৎপাটন করে সামাজিক ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে একটি সুন্দর শান্তিময় আদর্শ সমাজ গড়ে তোলেন, তা সত্যি বিস্ময়ের। পৃথিবীর বড় বড় মনীষীগণ মহানবী (স) প্রবর্তিত সামাজিক সংস্কারসমূহকে এক অতীব স্মরণীয় বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছেন। সামাজিক সংস্কারে মহানবীর (স) বৈপ্লবিক কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ ঃ

একত্ববাদের আদর্শে সমাজের পত্তন

মহানবী (স) ধর্মীয় ক্ষেত্রে নানা অনাচার পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করেন। তিনি সমগ্র সমাজকে এক আল্লাহতে বিশ্বাসী তাওহীদের আদর্শে নবরূপে রূপায়িত করেন। সকল ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বের উৎস একমাত্র আল্লাহকে মেনে নিয়ে সমাজের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার ব্যবস্থা করেন।

মানবতার ভিত্তিতে সমাজ গঠন

সামাজিক সাম্য, অকৃত্রিম ভ্রাতৃত্ব এবং মানবতার ভিত্তিতে তিনি যে উন্নত আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। তিনি অন্ধ আভিজাত্যের গৌরব ও বংশ মর্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করেন। মানুষে মানুষে সকল প্রকার অসাম্য ও ভেদাভেদ দূরীভূত করে মানবতার মহান আদর্শে সমাজকে ঢেলে সাজান।

সংঘাতমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা

তৎকালীন আরব সমাজে গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগেই থাকত। সামান্য অজুহাতে ভয়াবহ যুদ্ধের দামামা বেজে উঠত। আর তা দীর্ঘকাল যাবত দাবানলের মত জ্বলতে থাকত। রক্তপাত ও লুণ্ঠন ছিল তাদের নিত্য পেশা। মহানবী (স) এ সকল অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রাক নবুওয়াত, 'হিলফুল ফুযুল' এবং পরে 'মদীনা সনদে'র মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন।

শ্রেণীহীন ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠন

নিছক জন্মগত, বংশগত কিংবা ভাষাগত বা আঞ্চলিকতার বিচারে কোন মানুষের মর্যাদা ও প্রাধান্য মহানবী (স) স্বীকার করতেন না। তাঁর ভাষায়- "সকল মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে উৎকৃষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অনুগত এবং মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকামী।" এ নীতির ভিত্তিতে তিনি মানুষের মর্যাদা নির্ণয় করেন এবং সমাজকে ঢেলে সাজান।

দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদ

ঘৃণ্য দাস প্রথার মূলে তিনি কুঠারাঘাত করেন। জাহিলী যুগে পণ্য দ্রব্যের মত দাস-দাসীও হাটে বেচা-কেনা হত। তাদের কোন মানবিক স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল না। মহানবী (স) বহু যুগ ধরে প্রচলিত এ অমানবিক প্রথা উচ্ছেদ করে তাদেরকে সামাজিক মর্যাদা দান করেন। তিনি ক্রীত দাস যায়েদকে সেনাপতিত্ব দান করেন। তিনি হাবশী ক্রীত দাস বিলালকে ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন। তিনি ঘোষণা করেন- "দাস-দাসীদের মুক্তিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কার্য আল্লাহর কাছে আর কিছুই নেই।"

নারী জাতির সামাজিক মর্যাদা দান

মহানবী (স)-এর গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কারের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি। ইসলাম পূর্ব যুগে নারীর কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। তিনি নারী জাতির সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করে সম্মান ও গৌরবের আসনে

সমাসীন করেন। তিনি মহান আল্লাহর সাম্যের বাণী প্রচার করে বলেন- "পুরুষের নারীর উপর যতটা অধিকার আছে, নারীরও পুরুষের উপর ততটা অধিকার রয়েছে।" বিবাহ, বিধবা বিবাহ, তালাক, স্বামী ও পিতৃসম্পত্তিতে নারীর অধিকার দান করে সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। স্ত্রীদের প্রতি তিনি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেন। মায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করে তিনি বলেন- "মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশ্ত।" এভাবে তিনি নারী জাতির মুক্তির অগ্রনায়ক হিসেবে বিশ্বের বুকে খ্যাতিমান হয়ে আছেন।

ভিক্ষাবৃত্তির উচ্ছেদ

মহানবী (স) ভিক্ষাবৃত্তি মোটেও পছন্দ করতেন না। তিনি মানবতার শ্রেষ্ঠ হাতকে খাট করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। সকলকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করার পরামর্শ দেন।

অশ্লীলতা ও অনাচারের উচ্ছেদ

মহানবী (স) সমাজ থেকে যাবতীয় সামাজিক অশ্লীলতা, অনাচার, পাপাচার, ব্যভিচার, মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ, তথা যাবতীয় চরিত্র বিধ্বংসী কার্যকলাপ উচ্ছেদ করে এক সুস্থ্য কল্যাণময় পবিত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

আর্থ-সামাজিক অসাধুতা দূর

মহানবী (স) আর্থ-সামাজিক অসাধুতা, প্রতারণা, মিথ্যাচার, দুর্নীতি, হঠকারিতা, মজুদদারী, কালোবাজারী ইত্যাকার যাবতীয় অনাচার হারাম ঘোষণা করে, তা সমাজ থেকে উচ্ছেদ করেন এবং একটি সুন্দর পবিত্র সমাজ কাঠামো প্রবর্তন করেন।

মন্তব্য

কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অধঃপতিত আরব সমাজ মহানবী (স)-এর এহেন সংস্কার প্রচেষ্টায় নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। গোটা সমাজ সুন্দর পূত-পবিত্র শান্তিময় আদর্শ সমাজের রূপলাভ করে। একারণেই মহানবী (স)-কে পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক হিসেবে অভিহিত করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. পৃথিবীর বড় বড় মনীষীগণ মহানবীর (সা) প্রবর্তিত সামাজিক সংস্কারসমূহ কে আখ্যায়িত করেছেন?
   ক. এক অতীব স্মরণীয় বিপ্লব বলে খ. বড় ধরনের সংস্কার বলে
   গ. চমৎকার বিপ্লব বলে ঘ. অসামান্য বিপ্লব বলে।

২. তিনি সমগ্র সমাজকে যে আদর্শে নবরূপে রূপায়িত করেছেন-
   ক. গণতান্ত্রিক আদর্শে খ. সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শে
   গ. সাম্যের আদর্শে ঘ. তাওহীদের আদর্শে

৩. প্রাক-নবুওয়াত আমলে মুহাম্মদ (সা) সমাজে শান্তি আনয়নের জন্য সংগঠন করেছিলেন তার নাম-
   ক. মদিনা সনদ খ. 'হিলফুল ফুযুল'
   গ. হাজরে আসওয়াদে চুম্বন ঘ. হুদাইবিয়ার সন্ধি

৪. মহানবীর (সা) গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সংস্কারের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য-
   ক. ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ খ. দাসত্ব প্রথার বিলুপ্তি
   গ. নারী জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি ঘ. বিধবা বিবাহ চালু

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সামাজিক সংস্কারের কতিপয় দিক আলোচনা করুন।
২. দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদে মহানবীর (সা) ভূমিকা লিখুন।
৩. নারী জাতির সামাজিক মর্যাদা দানে বিশ্ব নবীর (সা) অবদান মূল্যায়ন করুন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক সংস্কারের বিবরণ দিতে পারবেন
- রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

প্রাক-ইসলামী যুগে আরবসহ গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত নৈরাজ্যমূলক, বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং ভয়াবহ। গোত্রতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'জোর যার মুল্লুক তার' এ সন্ত্রাসবাদী নীতিতেই তদানীন্তন রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হত। গোত্রকলহ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, হানাহানি লেগেই থাকত। কেন্দ্রীয় শাসন বলে কিছু ছিল না। রাজনৈতিক এমনি শোচনীয় দুর্দিনে আবির্ভূত হলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি নৈরাজ্যপূর্ণ আরব ভূমিতে যে অবিস্মরণীয় রাজনৈতিক বিপ্লব সাধন করেছিলেন তা বিশ্বের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। নিম্নে তার কিছু দিক তুলে ধরা হল ঃ

আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা

মানুষের মনগড়া আইন ও নৈরাজ্যপূর্ণ শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত আইন প্রতিষ্ঠা করে মহানবী (স) আরব উপমহাদেশে চির কাঙ্ক্ষিত শান্তি স্থাপন করেন। মহানবী (স) আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে ঃ "আল্লাহ তা'আলা যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী তাদের মধ্যে শাসন কার্য পরিচালনা করো। এ ব্যাপারে তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করোনা।" আর মহানবী (স) তাই করলেন।

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা

বিশ্বনবী (স) প্রবর্তিত ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহ তা'আলাকে নিরংকুশ একচ্ছত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষণা করেন। এ মর্মে মহান আল্লাহর বাণী ঃ "আকাশ মণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের রাজত্ব কেবল আল্লাহর। তার সিংহাসন আসমান ও যমীনের সর্বত্র বিস্তৃত। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারো হুকুম বা বিধান দেবার অধিকার নেই।"

আল-কুরআনকে সংবিধান ঘোষণা

মহানবী (স) আল-কুরআনকেই ইসলামী রাষ্ট্রের মূল সংবিধান ঘোষণা করেন। তিনি এরই নীতি ও আদর্শের নিরিখে রাষ্ট্র পরিচালনার বিধি-বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন।

লিখিত সংবিধান বা সনদ প্রণয়ন

মহানবী (স) আল-কুরআনের নীতিমালার উপর ভিত্তি করে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন। ইসলামের ইতিহাসে একে বলা হয় 'মদিনার সনদ'। আর এটাই পৃথিবীর প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র। এ সনদে ৪৭টি ধারা ছিল।

পরামর্শভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা

মহানবী (স) কুরআনের বিধান, নিজস্ব বিবেক এবং সাহাবাগণের মতামত ও পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তন

প্রাক ইসলামী যুগে আরবে কোন কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। গোত্রে গোত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির শাসন চলত। গোত্র প্রধানই ছিল দণ্ড-মুণ্ডের মালিক। তাই সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল না। মহানবী (স) এ গোত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থার উচ্ছেদ করে কেন্দ্রীয় শাসন এবং মদীনাতে একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন। এর মাধ্যমে শতধা বিভক্ত ও বিবাদমান গোত্রগুলোকে ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে সংহতি ও শান্তি স্থাপন করেন।

মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা

তৎকালীন বিশ্বে গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন নিদর্শন ছিল না। জোর যার মুল্লুক তার-এ নীতির অধীন দুর্বলরা সর্বদা সবলদের হাতে নির্যাতিত ও নিগৃহীত হত। মানবতার দরদী মহানবী (স) ঘোষণা করলেন, সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার সমান। ধনী-দরিদ্র, অভিজাত-নীচু, আশরাফ-আতরাফ, ইসলামের দৃষ্টিতে সকলেই সমান। সকল নাগরিকই মৌলিক অধিকার সমানভাবে ভোগ করবে।

অন্যধর্মাবলম্বীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা

মহানবী (স) অমুসলিম নাগরিকদের জান-মাল, মান-সম্মান এবং নিজস্ব ধর্মাচার পালনের পূর্ণ অধিকার ও নিরাপত্তা বিধান করেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকলের জন্য রাষ্ট্রীয় মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদের নিয়ে এক সাথে শান্তিতে বসবাস করার প্রচেষ্টা মানব ইতিহাসে এটাই প্রথম। পাশ্চাত্য মনীষী স্মীথ যথার্থই

বলেছেন "পৃথিবীতে যদি কেউ অন্য ধর্মাবলম্বীদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার গৌরব দাবি করতে পারে, তবে তিনি একমাত্র হযরত মুহাম্মদ (স) ছাড়া আর কেউ নন।"

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

জাহিলী যুগে অন্যায়-অবিচার, জুলুম ও অপরাধ প্রবণতার গঠনমূলক কোন বিচার বা শাস্তির ব্যবস্থা ছিলনা। ফলে অপরাধ প্রবণতা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার লাভ করে। হযরত মুহম্মদ (স) সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে সমাজ হতে অপরাধ প্রবণতা বিলুপ্ত করেন।

সুসংহত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

মহানবী (স) সুসংহত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং এর সুষ্ঠু পরিচালনার লক্ষ্যে সমগ্র আরব দেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা ও বিচারক নিযুক্ত করেছিলেন। প্রদেশগুলো ছিল- মদীনা, মক্কা, তায়িফ, তায়ামা, সানআ, খাইবার, ইয়ামেন, হাজরা-মাউত, ওমান এবং বাহরাইন। রাজধানী মদীনার মসজিদে নববীতে বসে তিনি প্রধান বিচারপতি ও প্রধান শাসনকর্তার কার্যাবলী সম্পাদন করতেন।

নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি

মহানবী (স) প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে শান্তিতে বসবাস করার লক্ষ্যে সম্পূর্ণ সৎ ও নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেন। যুদ্ধ নয় শান্তি এ ছিল তার পররাষ্ট্র নীতি। এ লক্ষ্যে তিনি বিশ্বের ছোট বড় সকল রাষ্ট্র এবং গোত্রের সাথে সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন। 'হুদাইবিয়ার সন্ধি' এবং 'মদীনা সনদ' ইত্যাদি এর প্রমাণ।

সার-সংক্ষেপ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ স) যে সংস্কার করেছেন এবং যে শিক্ষা রেখে গেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তিনি অনিন্দ্য সুন্দর শাশ্বত ঐশী ব্যবস্থাপনার দিক নির্দেশনার মাধ্যমে নৈরাজ্যপূর্ণ আরবসহ গোটা বিশ্বকে আদর্শ রাজনৈতিক ব্যবস্থার সন্ধান দেন। তিনি যে ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার আদর্শ স্থাপন করে গেছেন, তা অনুপম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ অধিবাসী হচ্ছে-
   ক. জনগণ খ. রাষ্ট্র
   গ. আল্লাহ তায়ালা ঘ. নবীগণ

২. ইসলামী রাষ্ট্রের মূল সংবিধান হচ্ছে-
   ক. আল-কুরআন খ. হাদীস
   গ. মজলিশে শূরা ঘ. সুন্নাহ

৩. মহানবী (সা) এর পররাষ্ট্র নীতির মূল কথা কি হচ্ছে-
   ক. শক্তি ও দমন নীতি খ. যুদ্ধোংদেহী
   গ. জিহাদের মাধ্যমে অন্যদেশ দখল ঘ. নিরপেক্ষ।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাক-ইসলামী যুগে আরবসহ গোটা বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?
২. হযরত মুহাম্মদ (সা) এর রাজনৈতিক সংস্কারের কিছু দিক তুলে ধরুন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অর্থনৈতিক সংস্কার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কারসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন
- অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী বিশ্ব-মানবতার এক দুর্যোগপূর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়। আরবসহ গোটা বিশ্বের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত ছিল। মরুময় আরবে কৃষির মাধ্যমে আয়-উপার্জন ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য। মরুবাসী আরব বেদুইনরা তাই পশুচারণ, লুটতরাজ এবং শহরাঞ্চলে ছোটখাটো ব্যবসায় বাণিজ্য করে জীবন ধারণ করত। জাতীয় সম্পদের বেশিরভাগই বিত্তশালী ও কুসিদজীবী ইহুদিদের হাতে পুঞ্জীভূত ছিল। তাদের চড়া ও চক্রবৃদ্ধিহারের সুদ ব্যবস্থার নি□ষণে সর্বশান্ত আরববাসীরা যখন দিশেহারা, এমনি এক যুগ সন্ধিক্ষণে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) আবির্ভূত হন।

মহানবী (স) অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সংস্কার সাধান করে একটি কল্যাণমুখী সুষম অর্থব্যবস্থা চালু করেন। যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক শোষণ-নির্যাতন বন্ধ হয়ে একটি আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে। নিম্নে মহানবীর (স) অর্থনৈতিক সংস্কারের বিবরণ দেওয়া হল ঃ

মহানবীর (স) প্রবর্তিত অর্থনৈতিক সংস্কারসমূহ

অর্থোপার্জনে নিয়ন্ত্রণ

মহানবী (স) সর্বপ্রথম সম্পদ উপার্জনের পন্থাকে নিয়ন্ত্রণ করলেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর নির্দেশ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে আত্মাৎ করো না।" এ ঘোষণার মাধ্যমে তিনি অর্থ-আয়ের অবৈধ উৎসমূহকে বন্ধ করে দিলেন। যেমন ঃ

১. **লুটতরাজ অপহরণ বন্ধ ঃ** পরের সম্পদ অপহরণ তথা চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, ছিনতাই, প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন বন্ধ করে দিলেন।

২. **ঘুষ নিষিদ্ধ ঃ** তিনি ঘুষকে অবৈধ ঘোষণা করেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) ঘোষণা করেন ঃ "ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ই নরকবাসী।"

৩. **প্রতারণা নিষিদ্ধ ঃ** প্রতারণা দ্বারা অর্থ আয়ের যাবতীয় উৎস বন্ধ করে দিয়ে তিনি ঘোষণা করেন- "যে ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় নেবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্যে কিংবা অন্য যে কোন ধরনের প্রতারণা-প্রবঞ্চনার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকে চিরতরে অবৈধ ঘোষণা করা হয়।

৪. **মজুদদারী ও কালোবাজারী বন্ধ ঘোষণা ঃ** এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেন ঃ "চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত রাখার পর যদি কেউ তা দান করেও দেয়, তবু এ অপরাধ ক্ষমা করা হবে না।" এ ঘোষণার মাধ্যমে বাজারে সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং অধিক মুনাফাখোরী-মজুদদারী ও কালোবাজারীর মনোবৃত্তি চিরতরে খতম করে দেওয়া হয়েছে।

৫. **সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ঃ** সুদ একটি জঘন্য আর্থ-সামাজিক অপরাধ। এর মাধ্যমে ধনী আরো ধনী হয় এবং গরীব আরো গরীব হয়। তাই এ অমানবিক অর্থ-উপার্জনের কু-প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলা হয় ঃ "আর আল্লাহপাক সুদকে হারাম ঘোষণা করেছেন।"

৬. **জুয়া নিষিদ্ধ ঃ** জুয়া-লটারী ইত্যাদি অবৈধ বস্তুর ব্যবসায়ও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৭. **বৈধ উপার্জনকে উৎসাহিতকরণ ঃ** বৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জনকে উৎসাহিত করা হয়। সৎভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্কে বলা হয় ঃ "ব্যবসায়কে আল্লাহ হালাল করেছেন"।

৮. **পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন ঃ** মহানবী (স) কায়িক পরিশ্রম করে কিংবা নিজ চিন্তা-ভাবনা ও মস্তিষ্ক খাটিয়ে বৈধভাবে অর্থ-উপার্জনকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন : "নিজ শ্রমে ব্যবসায়ী পরকালে শহীদদের সাথে অবস্থান করবেন।"

৯. **শ্রমের মর্যাদা দান ঃ** মহানবী (স) শ্রমের মর্যাদা দান এবং শ্রমিকের অধিকার স্বীকার করে ঘোষণা করেন - "যারা কাজ করে জীবিকা উপার্জন করে, তারা তোমাদের ভাই। তোমরা যা খাও, তাদেরকে তাই খেতে দেবে, তোমরা যা পরিধান কর তাদেরকেও তাই পরিধান করতে দেবে।" মহানবী (স) আরো বলেন ঃ "সর্বোত্তম কর্ম হলো বৈধ পন্থায় উপার্জন করা।"

অর্থ-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ঃ

মহানবী (স) অর্থোপার্জনের উৎসগুলো নিয়ন্ত্রণ করার পর অর্থ ব্যয়ের খাতগুলোও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন। যেমন-

১. **অপব্যয় রোধঃ** মহানবী (স) ঘোষণা করলেন বৈধভাবে উপার্জিত অর্থ-সম্পদও নিজের খেয়াল খুশীমত ব্যয় করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে এসেছে ঃ

"পরিমিতভাবে তোমরা খাও এবং পান কর। কিন্তু অপব্যয় করো না। কারণ অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।" এ ঘোষণার মাধ্যমে আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-ব্যসনে অর্থ ব্যয়কে নিরোৎসাহিত করা হয়েছে।

২. **মদ-জুয়া ইত্যাদি গর্হিত কাজে অর্থব্যয় নিষিদ্ধ ঃ** সে সময় মদ-জুয়া ইত্যাদি গর্হিত ও সমাজ বিরোধী কাজে অর্থ ব্যয় করে তারা অর্থনৈতিক অবকাঠামো ভেঙ্গে দিয়েছিল। মহানবী (স) এ সকল অবৈধ খাতে অর্থ ব্যয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

৩. **কল্যাণের পথে ব্যয়ের নির্দেশ ঃ** সুপথে ও কল্যাণের পথে ব্যয় করতে আদেশ দিয়ে বলা হয় যে, এ সকল ব্যাপারে ব্যয় করার ক্ষেত্রে কৃপণতা করা যাবে না। ব্যয়ের ক্ষেত্রে সর্বদা মধ্যম পন্থা এবং মিতব্যয়ী হতে হবে।

৪. **অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের নির্দেশ ঃ** মহানবী (স) এ ক্ষেত্রে যার যা প্রাপ্য ও অধিকার রয়েছে; যেমন পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা, স্ত্রী-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের অর্থনৈতিক দিক থেকে যে যতটুকু পাবে, তাকে তার প্রাপ্য ও অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায় করে দিতে বলা হয়েছে।

৫. **দুঃস্থ মানবতার সেবা ঃ** সমাজে যারা অর্থনৈতিকভাবে অক্ষম, দুঃস্থ ও বিপন্ন, গরীব-মিসকিন, দুঃখী, ইয়াতীম পথিকদেরকে যথাসম্ভব অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে।

৬. **জনকল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় ঃ** জনকল্যাণমূলক খাতে যেমন মাসজিদ, মাদরাসা, মক্তব, স্কুল, কলেজ, চিকিৎসালয়, সেতু, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি নির্মাণে অর্থ ব্যয় করার জন্যও মহানবী (স) উৎসাহিত করেছেন।

৭. **জিযিয়া কর চালু ঃ** অমুসলিম নাগরিকদের উপর ধার্যকৃত নিরাপত্তা কর, যা সামরিক বিভাগে খরচ হবে। তা আদায় করার জন্য অমুসলিমদেরকে বলা হয়েছে। এর বিনিময়ে তারা জীবন ও ইজ্জত ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ভোগ করবে।

৮. **আল-ফাই ঃ** এটা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি থেকে উৎপাদিত অর্থ আদায়কৃত কর, যা অভাবী জনসাধারণ ও দেশের কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হয়ে থাকে।

৯. **সাদকাহ ও ফিৎরা ঃ** রমযান শেষে ঈদের দিন সামর্থবান মুসলিমের উপর "সাদাকাতুল ফিতর" বাধ্যতামূলক করা হয়। এর মাধ্যমে অভাবীদের আনন্দ উৎসবের খরচ যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাছাড়া সাদকাহ বা সাধারণ দান করার প্রতিও মুসলিমদেরকে অনুপ্রাণিত করা হয়। যাতে দরিদ্রতার অভিশাপ হতে সমাজ বাঁচতে পারে।

সার-সংক্ষেপ

মহানবীর (স) আবির্ভাবের পূর্বে বিশ্বে আরবসহ সর্বত্র অসম ও নৈরাজ্যকর অর্থ ব্যবস্থার নি□ষণে বিশ্বমানবতা ছিল বিপন্ন। মহানবী (স) জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট, সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ পবিত্র এক অর্থ ব্যবস্থা চালু করেন। হালাল ব্যবসায়-বাণিজ্য, যাকাত, উশর, খারাজ, ফিৎরা, সাদকাহ, জিযিয়া, কর ইত্যাদি প্রবর্তন করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এক অভূতপূর্ব বিপ্লব আনয়ন করেন। এর ফলে সমাজে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সুষ্ঠুতা ফিরে আসে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. মহানবীর (স) প্রবর্তিত অর্থনৈতিক সংস্কারের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে-
   ক. কৃষি বিপ্লব
   খ. ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবাধ সুযোগ
   গ. উৎপাদন বৃদ্ধি
   ঘ. সম্পদ উপার্জনের পন্থা নিয়ন্ত্রণ।

২. হযরত মুহাম্মদ বলেছেন- ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়-
   ক. অপরাধী
   খ. পাপী
   গ. নরকবাসী
   ঘ. নি□*প*

৩. যে ব্যক্তি প্রতারণার আশ্রয় নেয় সে-
   ক. মুসলমানদের দলভুক্ত নয়
   খ. চোরদের দলভুক্ত নয়
   গ. প্রতারকদের দলভুক্ত
   ঘ. পাপীদের দলভুক্ত

৪. সুদ হচ্ছে-
   ক. আর্থ-সামাজিক অপরাধ
   খ. ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অপরাধ
   গ. আর্থিক অপরাধ
   ঘ. লাভজনক ব্যবসায়

৫. অপব্যয়কারী-
   ক. উদাসীন
   খ. খুব দানবীর
   গ. শয়তানের ভাই
   ঘ. মানুষের বন্ধু

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রবর্তিত অর্থনৈতিক সংস্কারসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।
২. হযরত মুহাম্মদ (স) প্রবর্তিত অর্থনৈতিক সংস্কারসমূহের পদক্ষেপ হিসেবে অর্থোপজানের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কি কি পন্থা গ্রহণ করেন তার বিবরণ দিন।
৩. অর্থ ব্যয় নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে হযরত মুহাম্মদ (স) এর পদক্ষেপ সমূহ কি ছিল?

জাতি গঠনকারী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এক জাতি গঠনের লক্ষে হযরত মুহাম্মদ (স) এর পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জাতি গঠনে অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কৃতিত্বময় জীবন মানবেতিহাসে এক অনন্য বিস্ময়। তাঁর কীর্তিময় জীবনের বিশেষ অবদান হচ্ছে- তিনি ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর ও বিকাশমান জাতির সফল প্রতিষ্ঠাতা। শতধা বিভক্ত আরব জাতিকে তিনি অল্প সময়ের মধ্যে একটি সংঘবদ্ধ আদর্শিক জাতিতে পরিণত করেছিলেন। তাঁর জীবনের বড় ধরনের সফলতা এখানেই।

জাতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে মহানবী (স) এর পদক্ষেপ

একটি সংঘবদ্ধ জাতি গঠন

আরব সমাজ ছিল গোত্রে গোত্রে শতধা বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন। বিশৃংখল ও কলহে লিপ্ত সেই আরব সমাজকে অতি অল্প সময়ে মহানবী (স) একটি সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেন। এতে তাঁর আত্মপ্রত্যয়, গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার স্বাক্ষর মেলে।

আদর্শের ভিত্তিতে জাতি গঠন

মানুষে মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদ ও পার্থক্য তুলে দিয়ে ধর্মের সেতু বন্ধনে এক আদর্শিক জাতি প্রতিষ্ঠায় মহানবীর (স) অবদান অনন্য। আরবের ইতিহাসে রক্তের পরিবর্তে ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ গঠনের এটাই প্রথম প্রয়াস।

বিশ্বজনীন জাতির প্রতিষ্ঠাতা

বিশ্বনবী (স) ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে ভৌগোলিক সীমারেখা, দেশ, বর্ণ, ভাষা গোত্র তথা সকল আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের গণ্ডি পেরিয়ে এক বিশ্বজনীন মুসলিম জাতি সত্তা প্রতিষ্ঠা করেন।

মানবতাবোধের উন্মেষ

হযরত মুহাম্মদ (স) আরবদেরকে সংকীর্ণ গোত্রপ্রীতি পরিহারে এবং মানবতাবোধের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন। মদীনায় আনসার ও মুহাজিরদেরকে ভ্রাতৃত্বের সুমহান বন্ধনে আবদ্ধ করে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন।

সকল সম্প্রদায়ের সমন্বয়

মহানবী (স) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি জাতি গঠন করেন। সকল ধর্ম-বংশ-গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে মদীনা সনদের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠনে তাঁর সফলতা বিস্ময়কর। তাঁর আদর্শ প্রজাতন্ত্রে সকল ধর্মাবলম্বী লোকদের পূর্ণ ধর্মীয় ও নাগরিক স্বাধীনতা প্রদান করেন। আর তাদেরই আন্তরিক সহযোগিতায় একটি জাতি গঠন করেন। যার ফলে আরবের বুকে এক নতুন সমাজ ও সভ্যতার বিকাশে নবযুগের সূত্রপাত হয়।

জাতি গঠনের নীতি

হযরত মুহাম্মদ (স) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত। তিনি সর্বপ্রথম দুনিয়ার সমস্ত ধর্মীয় সংঘাত দূর করে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি পূর্ববর্তী সকল ধর্ম নেতার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পোষণ করতে নির্দেশ দেন। তিনি অন্যদের প্রতি বিদ্বেষ বা তাদের দেব-দেবীর নিন্দা করতে নিষেধ করেন। পরধর্মের প্রতি উদারতা ও সহনশীলতা তাঁর মহত্বের পরিচয় দান করে। এর ফলে তাঁর জাতিগঠন প্রক্রিয়া সহজতর হয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ও অভিন্ন জাতি গঠনের আদর্শকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই তিনি আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহে উৎসাহ দান করেন। তিনি স্বয়ং ভিন্ন সম্প্রদায়ের রমণীদের পানি গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। তাঁর এসব কার্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল আরব-অনাবর বংশোদ্ভূত বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের জনসমষ্টির সমন্বয়ে এক সংহত বিশ্ব জনীন ইসলামী জাতি গঠন।

পররাষ্ট্র নীতি

পররাষ্ট্রের প্রতি শান্তির, সহযোগিতার ও সহ-অবস্থানের নীতি অবলম্বন করে তিনি তাদের সাথে দূত বিনিময়ের মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন।

সকল সম্প্রদায়ের ঐক্যবিধান

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের সময় সারা আরব উপদ্বীপ ছিল অনৈক্য, অরাজকতা ও অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। বহু দল উপদল ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত আরব ছিল পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত ও অধঃপতিত বিচ্ছিন্ন দেশ। বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রমণের সদা শঙ্কিত দেশ। মহানবী (স) অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে আরবের জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণে ও ঐক্যবিধানের সাধনায় তাঁর সমস্ত অন্তর শক্তি ও প্রজ্ঞা নিয়োজিত করেন। তাদেরকে এক জাতিভুক্ত করে সকলের বিস্ময়ের উদ্রেক করেন।

একটি নতুন রাষ্ট্রের জনক

মহানবীর (স) আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ধারণা ছিল না। তারা গোত্রতন্ত্র এবং শেখতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। মহানবী (স) মদীনায় হিজরতের পরপরই সেখানে সকল গোত্র ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে মদীনা সনদের মাধ্যমে একটি নতুন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। তিনি সে রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হন। ধর্ম ও রাষ্ট্রকে একই সূত্রে গ্রথিত করে ঐশীতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মিলন মোহনার সৃষ্টি করেন।

বিশ্বের প্রথম সংবিধান দাতা

বিশ্বনবী (স) মদীনার ইহুদি, খ্রিস্টান ও পৌত্তলিক প্রভৃতি অমুসলিম জনগোষ্ঠীর সমর্থন এবং সহযোগিতা নিয়ে সকলের অধিকার সম্বলিত একটি সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান রচনা করেন। যা পরবর্তীকালের সকল সংবিধানের অগ্রদূত ছিল। ঐতিহাসিক গীবন যথার্থই মন্তব্য করেন- "বিশ্বনবী (স) একাধারে ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকের ভূমিকা পালন করেন।"

বিশ্বে গণতান্ত্রিক বীজ বপনকারী

বিশ্বনবী (স) পৌত্তলিকতা বিতাড়নের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন; কিন্তু পৌত্তলিকদেরকে ঘৃণা করতে নিষেধ করেছেন। সকল পথ-মত-ধর্ম নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে মদীনার সংবিধান রচনা ও সহ অবস্থান ইত্যাদি গণতন্ত্রেরই বাস্তব রূপায়ণ। তিনি ক্রীতদাস যায়েদকে সেনাপতি নিয়োগ, কৃষ্ণাঙ্গ বিলালকে মুয়াজ্জিন নিয়োগ, ধনী-গরীব এক কাতারে নামায আদায়, সাদা-কালো সবাই একই সঙ্গে হজ্জ পালন, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রীতি অনুসরণ করে গণতান্ত্রিক আদর্শের বীজ বপন করে গেছেন।

সার-সংক্ষেপ

মহানবী (স) ছিলেন একটি নতুন জাতির সফল প্রতিষ্ঠাতা। হযরত মুহাম্মদ (সা) কেবল সংস্কারই ছিলেন না, তিনি একটি শক্তিশালী জাতির প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম বিভিন্ন সম্প্রদায় ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের লোকদের সমন্বয়ে একটি জাতি গঠনে সফলতা লাভ করেন। ঐক্যহীন আরব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। বহু দলে বিভক্ত জাতিকে একই আদর্শিক জাতিতে পরিণতি করেন। তিনি মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করেন। তিনি সংঘাত পরিহার করে জাতির মধ্যে শান্তি শৃংখলা স্থাপন করেন। হিট্টি যথার্থই বলেছেন- "মরণশীল জীবনের অতি স্বল্প পরিসরে মুহাম্মদ (স) অনৈক্য জর্জরিত অনমনীয় এক জনগোষ্ঠীকে এক ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করে ছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ৫.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (সা) যে বন্ধনে একটি আদর্শিক জাতি গঠন করেন তা হচ্ছে-
   ক. ভাষায় ভিত্তিতে
   খ. ভৌগোলিক সীমানার বন্ধনে
   গ. ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে
   ঘ. ধর্মের সেতু বন্ধনে

২. হযরত মুহাম্মদ (সা) এর মদীনা প্রজাতন্ত্রে সকল ধর্মের মানুষের ছিল-
   ক. ব্যক্তি স্বাধীনতা
   খ. ধর্মীয় স্বাধীনতা
   গ. ভোটের স্বাধীনতা
   ঘ. কথা বলার স্বাধীনতা

৩. হযরত মুহাম্মদ (সা) অন্য ধর্ম-নেতার প্রতি যে আচরণ করতে নির্দেশ দেন তা হচ্ছে-
   ক. শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করতে
   খ. নিন্দা ও অশ্রদ্ধা করতে
   গ. অস্বীকার ও অবিশ্বাস করতে
   ঘ. ঘৃনা ও বিদ্বেষ পোষণের

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. একটি জাতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গুলো বর্ণনা করুন।
২. সম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা) এর ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।
৩. বিশ্বে গণতান্ত্রিক ধারণা সৃষ্টিকারী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (সা) এর অবদান কি ছিল?

বিশদ-উত্তর প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্র ও জীবনাদর্শ বর্ণনা করুন।
২. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ধর্মীয় সংস্কারের বিবরণ দিন।
৩. সামাজিক ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর সংস্কারমূলক বিবরণ দিন।
   অথবা,
   সমাজ সংস্কারক হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মূল্যায়ন করুন।
৪. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাজনৈতিক সংস্কারের বিবরণ দিন।
৫. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অর্থনৈতিক সংস্কারসমূহ কি ছিল?
৬. একটি জাতি গঠনকারী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠ ৪.১ ঃ	১.খ	২.গ	৩.ঘ			
পাঠ ৪.২ ঃ	১.ক	২.গ	৩.ঘ	৪.ক	৫.ক	৬.ঘ
পাঠ ৪.৩ ঃ	১.ক	২.ঘ	৩.খ	৪.গ		
পাঠ ৪.৪ ঃ	১.গ	২.ক	৩.ঘ			
পাঠ ৪.৫ ঃ	১.ঘ	২.গ	৩.ক	৪.ক	৫.গ	
পাঠ ৪.৬ ঃ	১.গ	২.খ	৩ক			
পাঠ ৪.৭ ঃ	১.ক	২.গ				